بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ জুন, ২০১৯ মোতাবেক ২৮ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আরো কতিপয় ঘটনা ও উদ্ধৃতি রয়েছে, যেগুলো আজ আমি উপস্থাপন করবো। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র একটি সারিয়া বা অভিযান যা ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে বনু সুলায়েম এর প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) তাঁর মুক্ত দাস এবং সাবেক পালক-পুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে কতিপয় মুসলমানকে বনু সুলায়েম গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি তখন 'নাজাদের জমুঁ নামক স্থানে বসবাস করতো আর দীর্ঘকাল যাবৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতো, চক্রান্ত করতো এবং যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যেমন খন্দক বা পরিখার যুদ্ধেও এই গোত্রটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন 'জমুঁ' এ পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন সেখানে কেউ ছিল না, তারা খালি জায়গা দেখতে পান। কিন্তু মুযায়না গোত্রের হালীমা নামক এক ইসলাম বিরোধী মহিলা তাদেরকে সেই জায়গার সন্ধান প্রদান করে যেখানে সে সময় বনু সুলায়েম গোত্রের একাংশ নিজেদের গবাদি পশু চরাচ্ছিল। অতএব, এই সংবাদকে লুফে নিয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেই স্থানে অতর্কিত হামলা চালান এবং এই অতর্কিত আক্রমণে ভীতত্রস্ত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যায় কিন্তু কয়েকজন বন্দি এবং গবাদিপশু মুসলমানদের হস্তগত হয়। সেগুলো নিয়ে তারা মদিনায় ফিরে আসেন। দৈবক্রমে এই বন্দিদের মাঝে হালীমার স্বামীও ছিল আর যদিও সে যুদ্ধ-বন্দী ছিল কিন্তু মহানবী (সা.) হালীমার সেই সাহায্যের কারণে শুধু হালীমাকেই মুক্তিপণ ছাড়া মুক্ত করে দেন নি বরং তার স্বামীকেও অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দেন আর হালীমা ও তার স্বামী খুশি মনে স্বদেশে ফিরে যায়।

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে 'ঈস' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা হয়েছে যে, যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এর সেই অভিযান অর্থাৎ সারিয়া বনু সুলায়েম থেকে ফিরে আসার পর বেশিদিন অতিবাহিত হয় নি; মহানবী (সা.) জমাদিউল উলা মাসে তাকে একশ' সত্তর জন সাহাবীর নের্তৃত্ব প্রদান করে পুনরায় মদিনা থেকে প্রেরণ করেন আর ইতিহাসবিদরা এই অভিযানের কারণ যা লিখেছে তা হলো, সিরিয়া থেকে মুক্কার কুরাইশদের একটি কাফেলা আসছিল আর তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) এই দলটিকে প্রেরণ করেছিলেন।

এখানে এ ব্যাখ্যাও দিতে চাই যে, কুরাইশদের কাফেলা সাধারণত সশস্ত্র থাকতো আর মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াতকালে তারা মদিনার একেবারে পাশঘেষে যাতায়াত করতো যে কারণে সর্বদা তাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা বিরাজ করতো। এছাড়া এসব কাফেলা যেদিক দিয়েই যেতো আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতো । হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এ কারণে গোটা দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার এক ভয়াল অগ্নি জ্বলছিল, এজন্য তাদের দমন করা অপরিহার্য ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) (কুরাইশদের) কাফেলার সংবাদ পেয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন আর তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এবং সংগোপনে এগিয়ে যান যাতে কেউ টের না পায়, আর 'ঈস' নামক স্থানে গিয়ে সেই কাফেলাকে ধরে ফেলেন। 'ঈস' একটি জায়গার নাম, যা মদিনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রের পাশে অবস্থিত। যেহেতু এটি অতর্কিত আক্রমণ ছিল তাই কাফেলার লোকেরা মুসলমানদের আক্রমণের সামনে দাড়াতে পারে নি আর নিজেদের সকল মালপত্র ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। যায়েদ (রা.) কয়েকজন বন্দি এবং কাফেলার মালপত্র করতলগত করে মদিনায় ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

একথা স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক সারিয়া অভিযান অথবা যে যুদ্ধই হয়েছে, যে সৈন্যবাহীনিই প্রেরণ করা হয়েছে এর কারণ হলো, (কাফিরদের) কাফেলার পক্ষ থেকে কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যেতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে (এরা) ষড়যন্ত্র করছে অথবা কোন চক্রান্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

এরপর হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে 'তারাফ' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উল্লেখও পাওয়া যায় আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এর উল্লেখ করেছেন যে, বনু লেহইয়ান যুদ্ধের কিছুকাল পরে ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে পনেরজন সাহাবীর একটি দলকে 'তারাফ'এর দিকে প্রেরণ করেন, যা মদিনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত আর সে সময় ঐ স্থানে বনু সালেবা গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। কিন্তু যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই এই গোত্রের লোকেরা আগাম সংবাদ পেয়ে এদিকে-সেদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর যায়েদ (রা.) ও তার সঙ্গীরা (তাদের) অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং এরপর মদিনায় ফিরে আসেন আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন নি এবং তাদের সন্ধানও করেন নি।

এরপর যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়া বা অভিযান রয়েছে যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে হিসমা-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এই জমাদিউল আখের মাসেই মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে পাঁচশ' মুসলমানসহ হিসমা-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যা মদিনার উত্তর দিকে বনু জুযাম এর নিবাস ছিল। তারা সেখানে বসবাস করতো। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী, যার নাম ছিল দাহিয়া কালবী, তিনি রোমান সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন আর তার সাথে কিছু মালপত্রও ছিল, যার কিছু সম্রাটের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ছিল আর কিছু ছিল পোশাক আর ছিল কিছু বানিজ্যিক পণ্য। দাহিয়া (রা.) যখন বনু জুযাম এর এলাকা অতিক্রম

করছিলেন তখন ঐ গোত্রের নেতা হুনায়েদ বিন আরেয নিজ গোত্রের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে দাহিয়া (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে বসে এবং সব মালপত্র ছিনিয়ে নেয়, বানিজ্যিক পণ্য এবং অন্যান্য মালপত্রও যা কিছু সম্রাট দিয়েছিলেন তা-ও। এমনকি এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, দাহিয়া (রা.)'র দেহেও ছেড়া কাপড় ছাড়া কোন কিছুই আর বাদ রাখেনি। বনু যুবায়েব যখন এই আক্রমণের সংবাদ পায়, যারা বনু জুযাম এর একটি শাখা ছিল যাদের কতক মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা বনু জুযামের সেই দলটির পিছু ধাওয়া করে তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রী ছিনিয়ে আনে এবং দাহিয়া (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন সেই মালপত্র নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। এখানে এসে দাহিয়া (রা.) মহানবী (সা.)-কে পুরো ঘটনা অবহিত করেন তখন মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে প্রেরণ করেন আর দাহিয়াকেও যায়েদ এর সাথে প্রেরণ করেন। যায়েদ (রা.)'র দলটি অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত আর রাতের বেলা সফর করত আর এভাবে সফর করতে করতে হিসমা'র দিকে অগ্রসর হতে থাকে আর একেবারে প্রভাতকালে বনু জুযাম এর লোকদের গিয়ে ধরে ফেলে। বনু জুযাম মোকাবিলা করে, রীতিমত যুদ্ধ হয়, কিন্তু মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণের সামনে তারা টিকতে পারে নি আর কিছুক্ষণ মোকাবিলা করার পর তারা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। আর যায়েদ বিন হারেসা বহু জিনিসপত্র, সম্পদ, গবাদিপশু এবং প্রায় একশত বন্দি সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু যায়েদের মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই বনু জুযাম-এর শাখা বনু যুবায়েব গোত্রের লোকেরা যায়েদের এই অভিযানের খবর পায় আর তারা তাদের নেতা রিফা বিন যায়েদ-এর সাথে মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, (যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই মালপত্র উদ্ধার করেছিল,) আর আমাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের অনুকূলে শান্তিচুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ চুক্তি হয়েছে যে, তারা নিরাপত্তা পাবে। প্রশ্ন হলো আমাদের গোত্রকে কেন আক্রমণ করা হলো? এই আক্রমণে তাদের গোত্রের কিছু লোকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এটি সত্য কথা, কিন্তু যায়েদ এ কথা জানতো না। এছাড়া তখন যারা নিহত হয়েছিল তাদের জন্য মহানবী (সা.) বার বার সমবেদনা প্রকাশ করেন। এতে রিফা-এর সাথি আবু যায়েদ বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যারা নিহত হয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা কোন দাবি করছি না। এটি একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ছিল যা ঘটেছে। অর্থাৎ আমাদের সাথে যাদের চুক্তি আছে তাদেরকেও যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যারা জীবিত আছে আর আমাদের গোত্রের কাছ থেকে যে মালপত্র যায়েদ দখল করেছেন, তা আমাদের হাতে ফেরত আসা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এটি একান্ত সঠিক কথা। আর তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আলীকে যায়েদের কাছে প্রেরণ করেন এবং চিহ্নস্বরূপ তাকে নিজের তরবারি প্রদান করেন এবং যায়েদের কাছে এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, এই গোত্রের যেসব বন্দি এবং মালপত্র তোমার করতলগত হয়েছে বা যে ধনসম্পদই তুমি দখল করেছ তা ছেড়ে দাও। যায়েদ এই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের কাছ থেকে নেয়া গনিমতের মাল তাদেরকে ফেরত দেন।

অতএব চুক্তি বা সন্ধি পালনের ক্ষেত্রে এই ছিল মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শ। এমন নয় যে, বন্দি করেছেন বিধায় তাদের ওপর নির্যাতন করতে হবে, বরং ভুল বোঝাবুঝির কারণে যা কিছু হয়েছে, কিছু গোত্র প্রভাবিত হয়ে থাকবে, আর হতে পারে তাদের কতিপয়

ইচ্ছাকৃতভাবে অংশ নিয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের মালপত্রও তাদেরকে ফেরত দেন।

এরপর হযরত যায়েদের আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরী সনের রজব মাসে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উল্লেখও পাওয়া যায়। হিসমা-র অভিযানের এক মাস পর মহানবী (সা.) পুনরায় যায়েদ বিন হারেসাকে 'ওয়াদিউল কুরা'-য় প্রেরণ করেন। যায়েদের বাহিনী যখন 'ওয়াদিউল কুরা'-য় পৌঁছে তখন বনু ফাযারা গোত্রের লোকেরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। অতএব এই লড়াইয়ে বেশ কিছু মুসলমান শহীদ হন। স্বয়ং যায়েদও আহত হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তাকে রক্ষা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এই অভিযানে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক যে স্থানের উল্লেখ হয়েছে তা মদিনার উত্তরে সিরিয়া যাওয়ার পথে একটি বসতিপূর্ণ উপত্যকা ছিল যেখানে ছিল অনেকগুলো গ্রামের বসতি। এ কারণেই এর নাম 'ওয়াদিউল কুরা' হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ এমন উপত্যকা যা ছিল বহু গ্রামের আবাসস্থল ।

মুতা-র অভিযান অষ্টম হিজরী সনে হয়। মুতা বালকা-র কাছে সিরিয়ায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই অভিযানের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে সাদ লিখেন, মহানবী (সা.) হারেস বিন উমায়েরকে দূত হিসেবে বসরার অধিপতির কাছে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন শারাহবীল বিন আমর গাস্সানী তাকে শহীদ করে। হযরত হারেস বিন উমায়ের ব্যতিরেকে মহানবী (সা.) এর আর কোন দূতকে শহীদ করা হয় নি। যাহোক এই মর্মান্তিক ঘটনায় মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সা.) মানুষকে আহ্বান করলে তারা খুব দ্রুত জুর্ফ নামক স্থানে একত্রিত হয়ে যায়, যাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, সবার আমীর হলেন যায়েদ বিন হারেসা। আর একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদকে দিতে গিয়ে এ নসীহত করেন যে, হারেস বিন উমায়েরকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর। যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, না হলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) মুতার যুদ্ধের জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নিযুক্ত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ শহীদ হয়ে গেলে জাফের আমীর হবেন। আর যদি জাফেরও শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তোমাদের আমীর হবেন। এই সেনাবাহিনীকে 'জাইশুল উমারা'-ও বলা হয়। সহীহ্ বুখারী এবং মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও এর উল্লেখ রয়েছে। রেওয়ায়েতে এটিও উল্লিখিত আছে যে, হযরত জাফের মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমার কখনো এই ধারণাই হয় নি যে, আপনি যায়েদকে আমার ওপর আমীর নিযুক্ত করবেন। তিনি (সা.) বলেন, এ কথা ছাড়, কেননা তুমি জান না যে, কোনটি উত্তম। মুতা অভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বলেছেন, যদিও এ ঘটনার কিছুটা উল্লেখ আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বা কয়েক মাস পূর্বে খুতবায় করেছিলাম, কিন্তু এখানে যেহেতু যায়েদের প্রেক্ষাপটে কথা হচ্ছে তাই পুনরায় উল্লেখ করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে এই যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়েছিলেন। কিন্তু একইসাথে তিনি (সা.) এটিও বলেছিলেন যে, আমি এখন যায়েদকে এই সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করছি,

যায়েদ যদি যুদ্ধে নিহত হন তাহলে তার স্থলে জাফের বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন, আর যদি তিনিও নিহত হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব দিবেন। আর যদি তিনিও নিহত হন তাহলে মুসলমানরা একমত হয়ে যাকে নির্ধারণ করবে তিনি বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। তিনি (সা.) যখন এই কথা বলেন তখন এক ইহুদীও তাঁর (সা.) কাছে বসা ছিল। সে বলে, আমি যদিও আপনাকে নবী মানি না কিন্তু আপনি সত্য হয়ে থাকলে এই তিন জনের কেউ জীবিত ফিরবে না, কেননা নবীর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা পূর্ণ হয়ে থাকে। কয়েক মাস পূর্বে এই ঘটনার যা উল্লেখ হয়েছিল সেখানে সম্ভবত এটি বলা হয়েছিল যে, সেই ইহুদী হযরত যায়েদের কাছে যায় এবং তাকে এই কথা বলে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই রেওয়ায়েতকে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তীতে সেই ইহুদী হযরত যায়েদের কাছে যায় এবং তাকে বলে যে, তোমাদের রসূল যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তুমি জীবিত ফিরবে না। হযরত যায়েদ বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসবো কী আসবো না, সেটি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, কিন্তু আমাদের রসূল (সা.) অবশ্যই সত্য রসূল। আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে এই ঘটনা হুবহু এভাবেই পূর্ণ হয়। হযরত যায়েদ শহীদ হন। তার পর হযরত জাফের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও শহীদ হন। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও শহীদ হন। এরপর মুসলিম বাহিনীর মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার উপক্রম হলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের অনুরোধে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা নিজের হাতে নেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং তিনি নিরাপদে সেনবাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন।

বুখারীতে এই ঘটনার উল্লেখ যেভাবে পাওয়া যায় তাহলো, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা নিজের হাতে নেন এবং শহীদ হন। এরপর জাফের তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তিনিও শাহাদত বরণ করেন। এই সংবাদ দেয়ার সময় মহানবী (সা.) এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বলেন, এরপর খালেদ বিন ওয়ালীদ সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও পতাকা হাতে নেন এবং তিনি বিজয় লাভ করেন। মহানবী (সা.) এর কাছে যখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত জাফের এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি (সা.) তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। হযরত যায়েদের সংবাদের মাধ্যমে তিনি সূচনা করেন। তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে মাগফিরাত কর। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! জাফের এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে ক্ষমা কর। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত জাফের এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা যখন শহীদ হন তখন মহানবী (সা.) মসজিদে বসে পড়েন এবং তাঁর চেহারায় দুঃখ ও কষ্টের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

তাবাকাতুল কুবরায় লেখা আছে যে, হযরত যায়েদের শাহাদতের পর মহানবী (সা.) তার পরিবারের কাছে সমবেদনা জানানোর জন্য যান। তার কন্যার চেহারায় ক্রন্দনের ছাপ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। এতে মহানবী (সা.) এর চোখ থেকেও অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত যায়েদ বিন উবাদা নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) এটি কী? আপনার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে! তিনি (সা.) বলেন-

'হাযা শওকুল হাবীবে ইলা হাবীবিন'। অর্থাৎ এটি এক প্রেমিকের তার প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসা। হযরত যায়েদের শাহাদতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে সাদ লিখেন, মহানবী (সা.) মুতার অভিযানে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য আমীরদের ওপর তাকে অগ্রগণ্য করেন। মুসলমান এবং মুশরিকদের যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ হয় তখন মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত আমীরগণ পদাতিক যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করছিলেন। হযরত যায়েদ ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং যুদ্ধ করেন। আর অন্যরাও তার সাথী হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদের জানাযা পড়ান এবং বলেন হযরত যায়েদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা কর, তিনি দৌঁড়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

হযরত ওসামা যিনি হযরত যায়েদ বিন হারেসার পুত্র ছিলেন, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তাকে অর্থাৎ হযরত ওসামাকে ও হাসানকে কোলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্ এদের উভয়কে ভালোবাস কেননা আমি এদের উভয়কে ভালোবাসি। হযরত জাবালা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোন যুদ্ধে না গেলে হযরত আলী অথবা হযরত যায়েদ ছাড়া তিনি নিজের অস্ত্র আর কাউকে দিতেন না।

হযরত জাবালা আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) এর কাছে দুটি হওদা তোহফাস্বরূপ দেয়া হলে তার একটি তিনি (সা.) নিজে রাখেন এবং দ্বিতীয়টি হযরত যায়েদকে দিয়ে দেন।

পুনরায় হযরত জাবালারই বর্ণনা, তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে দুটি জুব্বা উপহারস্বরূপ উপস্থাপিত হয়। তিনি (সা.) একটি নিজের জন্য রাখেন এবং দ্বিতীয়টি হযরত যায়েদকে দান করে দেন।

অপর এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মহানবী (সা.) এর প্রেমিক বলা হতো। হযরত যায়েদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের মাঝ থেকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ যায়েদ। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করেন আর মহানবী (সা.) মুক্ত করে তাকে পুরস্কৃত করেন।

মুতার যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারাংশ হলো, মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মহানবী (সা.) অনেক বড় একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন আর একাদশ হিজরী সনের সফর মাসে মহনবী (সা.) মানুষকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যদিও এই মুতার যুদ্ধের পর যে বাহিনী গঠন করেছিলেন তার সাথে যায়েদ বিন হারেসার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছিলেন, কিন্তু সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের কারণের মাঝে হযরত যায়েদ বিন হারেসার উল্লেখও করা হয়। তাই এ অংশটিও আমি বর্ণনা করছি। সম্ভবত কিছু দিন পূর্বে হযরত ওসামার স্মৃতিচারণের সময়ও এর কিয়দংশ আলোচিত হয়েছিল। যাহোক হযরত ওসামা বদরী সাহাবী ছিলেন না, তখন তিনি অনেক ছোট ছিলেন। তথাপি আমি যেহেতু সাধারণভাবে সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছিলাম তাই তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। যাহোক এই বাহিনী গঠিত হওয়ার পরের দিন মহানবী (সা.) হযরত ওসামা বিন যায়েদকে ডেকে পাঠান এবং এই অভিযানের নেতৃত্ব তার হাতে অর্পণ করে বলেন, তোমার

পিতার শাহাদত-স্থলের দিকে যাও। আর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, রওয়ানা হওয়ার পর তড়িৎগতিতে পথ চল এবং তারা সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যাও। এরপর সকাল হতেই সিরিয়ার বালকা অঞ্চলে মুতার নিকটস্থ 'উবনা' নামক স্থানে আক্রমণ কর, যেখানে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল। আর বালকা, যা সিরীয়ায় অবস্থিত একটি অঞ্চল যা দামেস্ক এবং ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, যা সম্পর্কে লিখা রয়েছে যে, হযরত লূতের বংশধর হতে বালেক নামের এক ব্যক্তি এ বসতি গড়ে তুলেছিল, এছাড়া দারুম সম্পর্কে লিখা রয়েছে যে, মিশর যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনের গাজওয়া নামক স্থানে অবস্থিত একটি জায়গা; যাহোক মহানবী (সা.) বলেন, হযরত যায়েদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এসব জায়গাকে নিজের ঘোড়ার পদতলে দলিতমথিত কর। মহানবী (সা.) ওসামাকে আরো বলেন, নিজের সাথে পথ চেনে এমন মানুষ নিয়ে যাও এবং সেখানকার সংবাদ সংগ্রহের জন্যও লোক নিয়োগ দাও, যে তোমাকে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সফলতা দান করুন। আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই অভিযানের সময় হযরত ওসামার বয়স ১৭ থেকে ২০ বছরের মাঝামাঝি ছিল। মহানবী (সা.) হযরত ওসামার জন্য স্বহস্তে একটি পতাকা বাঁধেন এবং হযরত ওসামাকে বলেন, আল্লাহ্‌র নামে তাঁর পথে জিহাদ কর আর যে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তার সাথে যুদ্ধ কর। হযরত ওসামা এই পতাকা নিয়ে বের হন এবং সেটিকে হযরত বুরায়দার হাতে তুলে দেন। এই বাহিনী জুর্‌ফ নামক স্থানে একত্রিত হতে থাকে। জুর্‌ফ মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। বলা হয় এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এই বাহিনীতে মুহাজের ও আনসারদের সবাই যোগ দেন। এদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ, হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস-এর মতো মহান ও জ্যেষ্ঠ সাহাবীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তাদের এই বাহিনীর নেতা নির্ধারণ করা হয় হযরত ওসামাকে, যার বয়স ছিল ১৭/১৮ বছর। কিছু মানুষ হযরত ওসামার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, এই বালককে এত অল্প বয়সে প্রথম সারির মুহাজেরদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন। মহানবী (সা.) তাঁর মাথা একটি রুমাল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তিনি একটি চাদর দিয়ে শরীর আবৃত করে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোক সকল! এটি কেমন কথা, যা তোমাদের কারো কারো পক্ষ থেকে ওসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে আমার কাছে পৌঁছেছে। ওসামাকে আমীর নিযুক্ত করার আমার সিদ্ধান্তে তোমরা যদি আপত্তি করে থাক তাহলে এর পূর্বে তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করার কারণেও তোমরা আপত্তি করেছিলে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! সে-ও অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসা নিজের মাঝে আমীর হওয়ার গুণাবলী লালন করত এবং তার পরে তার ছেলেও নিজের মাঝে আমীর হওয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সে তাদের অন্তর্গত ছিল যারা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং এরা দুজনই নিশ্চিতভাবে সকল প্রকার কল্যাণ লাভের অধিকার রাখে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, অতএব তার অর্থাৎ ওসামার জন্য কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর, কেননা সে তোমাদের উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। এটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের ২দিন পূর্বের কথা। হযরত ওসামার সাথে যেসব মুসলমান রওয়ানা হচ্ছিলেন, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বিদায় জানিয়ে জুর্‌ফ নামক স্থানে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য চলে যান। মহানবী (সা.)-এর রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় কিন্তু তিনি (সা.) জোরালোভাবে বলেন, ওসামার

সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দাও। রবিবার রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যথা আরো বেড়ে যায় আর হযরত ওসামা সেনাদলের সাথে ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) অচেতন অবস্থায় ছিলেন। সেদিন মানুষ তাঁকে ঔষধ পান করিয়েছিল। হযরত ওসামা মাথা নিচু করে মহানবী (সা.)-কে চুমু খান। তিনি (সা.) তখন কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি (সা.) তাঁর দুই হাত আকাশ পানে উঠিয়ে হযরত ওসামার মাথায় রাখেন। হযরত ওসামা বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করছেন। হযরত ওসামা সৈন্য বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন। সোমবারে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থার উন্নতি হয় আর তিনি (সা.) হযরত ওসামাকে বলেন, ঐশী কল্যাণে সুরভিত হয়ে যাত্রা কর। হযরত ওসামা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান এবং মানুষকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে তার মা হযরত উম্মে আয়মানের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এই বার্তা নিয়ে আসে যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে হচ্ছে, অসুস্থতা অনেক বেড়ে যায়। এই দুঃখজনক সংবাদ শোনামাত্রই হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দার সাথে হযরত ওসামা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন, ফিরে আসেন। তারা দেখেন যে মহানবী (সা.) অন্তিম লগ্ন অতিবাহিত করছেন। ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্যাস্তের পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন, যে কারণে মুসলিম সৈন্য বাহিনী জুর্‌ফ থেকে মদিনায় ফিরে আসে। হযরত বুরায়দা হযরত ওসামার পতাকাটি মহানবী (সা.)-এর ঘরের দরজায় গেড়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে সবার বয়আত করার পর হযরত আবু বকর হযরত বুরায়দাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, পতাকা নিয়ে ওসামার বাড়ি যাও, সে যেন স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন, তা নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়। হযরত বুরায়দা পতাকা নিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বে যে স্থানে সমবেত হয়েছিল সে স্থানে চলে যান। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর পুরো আরবে, সাধারণ হোক বা বিশেষ, প্রায় প্রত্যেক গোত্রেই ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের মাঝে কপটতা প্রকাশ পেয়েছিল। তখন ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল আর একথা ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল যে, এখন দেখি কী হয়? এছাড়া প্রতিশোধ নেয়ার জন্যও তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল এবং মুসলমানদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে মুসলমানদের অবস্থা ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ রাতে একটি ছাগলের অবস্থা যেমন হয় তেমনিই ছিল। খুবই কঠিন অবস্থায় ছিল তারা। বড় বড় সাহাবীরা হযরত আবু বকরের সমীপে নিবেদন করেন যে, অবস্থার সংবেদনশীলতার নিরিখে ওসামার সেনাবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করুন, কিছুটা বিলম্বিত করুন, তারা কয়েকদিন পর যাত্রা করুক। তখন হযরত আবু বকর অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যদি বন্যপশু আমাকে টানাহ্যাঁচড়া করে তবুও আমি এই সেনাদলকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রেরণ করেই ছাড়ব আর আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জারিকৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই ছাড়বো। অধিকন্তু এই জনপদে আমি যদি এক-নিসঙ্গও থেকে যাই তবুও আমি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই ছাড়ব। যাহোক তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর বাস্তবায়ন করেন এবং যেসব সাহাবী ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদেরকে জুর্‌ফে ফিরে গিয়ে পুনরায় ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে পূর্বে ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিল আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তাতে অন্তর্ভুক্ত হবার আদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন কোন অবস্থাতেই পিছনে না থাকে আর না আমি তাকে পশ্চাতে থাকার

অনুমতি দিব। তাকে যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয় তাকে অবশ্যই সাথে যেতে হবে। যাহোক সেনাদল পুনরায় প্রস্তুত হয়ে যায়। কতিপয় সাহাবী পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে পুরনরায় পরামর্শ দেয় যে, আপাতত এই সেনাদলকে থামানো হোক। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওসামা হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন যে, আপনি হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে গিয়ে তাকে বলুন তিনি যেন সেনাদলের যাত্রা রহিত করেন যাতে আমরা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি আর রসূলের খলিফা ও রসূলের স্ত্রীদের আর মুসলমানদের'কে মুশরিকদের আক্রমণ থেকে যেন রক্ষা করতে পারি। এছাড়া কতিপয় আনসার সাহাবা হযরত ওমর (রা.)-কে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা হযরত আবু বকর যদি সেনাদল প্রেরণে অনড় থাকেন আর যদি এটাই নির্বন্ধ হয় তাহলে তাঁকে নিবেদন করুন, তিনি যেন এমন কোন ব্যক্তিকে সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করেন যিনি বয়সে ওসামার চেয়ে বড় হবেন। মানুষের এই প্রস্তাব নিয়ে হযরত ওমর যখন হযরত আবু বকরের কাছে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকর পুনরায় সেই লৌহদৃঢ় সংকল্পের সাথে বলেন, যদি জঙ্গলের হিংস্র পশুরা মদিনায় প্রবেশ করে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি সেই কাজ করা থেকে বিরত হব না যে কাজ করার নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদান করেছেন। এরপর হযরত ওমর কতিপয় আনসারের পক্ষ থেকে বার্তা শুনালে সেটি শুনতেই হযরত আবু বকর (রা.) প্রতাপের সাথে বলেন, তাকে অর্থাৎ ওসামাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমীর মনোনীত করেছেন আর তোমরা আমাকে বলছ যে, আমি যেন তাকে এই পদ থেকে সরিয়ে দিই? হযরত আবু বকরের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনে আর তার লৌহদৃঢ় সংকল্প দেখার পর হযরত ওমর সেনাদলের কাছে যান। মানুষ যখন জিজ্ঞেস করে যে, কী হলো? তখন হযরত ওমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। কেবল তোমাদের কারণে আমাকে আজ রসূলের খলীফার কাছে বকা শুনতে হয়েছে। যখন হযরত আবু বকরের নির্দেশ অনুযায়ী ওসামার সেনাদল জুর্‌ফ নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন হযরত আবু বকর স্বয়ং সেখানে গিয়ে সেনাদল নিরীক্ষণ করেন এবং এটিকে সুবিন্যস্ত করেন।যাত্রাকালীন দৃশ্যও ছিল অভাবনীয়। সে মুহূর্তে হযরত ওসামা আরোহিত ছিলেন অথচ খলিফাতুর রসূল হযরত আবু বকর পায়ে হাঁটছিলেন। হযরত ওসামা নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! হয় আপনি বাহনে আরোহন করুন নতুবা আমিও নিচে নেমে আসছি। তখন হযরত আবু বকর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমিও বাহন থেকে নামবে না আর আমিও বাহনে চড়ব না আর আমার কী হয়েছে যে, আমি এক মুহূর্তের জন্য আমার পদযুগল আল্লাহ্‌র পথে ধুলিধুষরিত করবো না কেননা গাজী যখন এক পদক্ষেপ নেয় তখন এর প্রতিদানে তার জন্য সাত শত পুণ্য লেখা হয় আর তাকে সাত শতগুণ উচ্চতা দান করা হয় এবং তার সাত শত দোষত্রুটি মুছে দেয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মদীনায় বেশ কয়েকটি কাজের জন্য হযরত ওমরের প্রয়োজন ছিল। হযরত আবু বকর তাকে নিজ থেকে আটকানোর পরিবর্তে হযরত ওসামার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, তিনি যদি উত্তম মনে করেন তাহলে হযরত ওমর'কে মদিনায় হযরত আবু বকরের কাছে অবস্থানের অনুমতি দিতে পারেন। হযরত ওসামা যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত ওমরকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন। এই ঘটনার পর যখনই হযরত ওমর ওসামার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, **'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর'** অর্থাৎ হে আমীর! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত

হোক। হযরত ওসামা উত্তরে বলতেন, **'গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া আমিরাল মু'মিনিন'** অর্থাৎ হে আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।

যাহোক হযরত আবু বকর অবশেষে সেনাদলকে এই বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, চুরি করবে না আর মুসলা করবে না অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোধীদলের যারা মারা যায় অথবা নিহত হয় তাদের মৃতদেহ বিকৃত করবে না। ছোট শিশু, বৃদ্ধ আর মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করবে না এবং পোড়াবেও না। কোন ভেড়া, গরু অথবা উটকে খাবারের উদ্দেশ্য ছাড়া জবাই করবে না। এরপর তিনি বলেন যে, তোমরা অবশ্যই এমন এক জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেরা গির্জায় ইবাদতে নিবেদিত থাকবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু বলবে না। তোমাদের সাথে এমন লোকদেরও সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের পাত্রে করে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসবে, তোমরা যদি তা থেকে খাও তাহলে বিসমিল্লাহ্ পড়ে খাবে। আর তোমরা অবশ্যই এমন জাতির কাছে পৌঁছবে যারা নিজেদের মধ্যমাথার চুল কামিয়ে রাখবে কিন্তু মাথার চতুর্দিকের চুল ঝুটির ন্যায় ছেড়ে রাখবে। অতএব তোমরা এমন লোকদেরকে তরবারির হালকা আঘাত করো আর আল্লাহ্র নাম নিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে অপমান-লাঞ্চনা আর প্লেগের মহামারি থেকে সুরক্ষা করুন। অতঃপর হযরত আবু বকর হযরত ওসামাকে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তার সবকিছু করবে। এই সমস্ত কথা দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, যেখানে হযরত আবু বকর হযরত ওসামাকে ইসলামী যুদ্ধের রীতিনীতি মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থাৎ কোন প্রকার অত্যাচার করা যাবে না, সেখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, এই সেনাদলের বিজয়ের বিষয়েও তাঁর সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বলেন যে, তুমি সফলতা লাভ করবে। যাহোক একাদশ হিজরী সনের রবিউল আখের মাসের **১** তারিখে হযরত ওসামা যাত্রা করেন। হযরত ওসামা নিজ সেনাদল সাথে মদিনা থেকে যাত্রা করে ক্রমাগতভাবে পথ অতিক্রম করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওসিয়্যত অনুযায়ী সিরিয়ার উবনা-য় পৌঁছেন আর প্রভাত হতেই তিনি সেই এলাকায় চতুর্মুখী হামলা করেন। এই যুদ্ধে যে স্লোগান বা নারাহ্ ছিল তা হলো-

'ইয়া মানসূরু আমিদতা' অর্থাৎ হে সাহায্যপুষ্ট! হত্যা করো। এ যুদ্ধে যে-ই মুসলিম মুজাহিদদের সাথে মোকাবিলা করেছে সে নিহত হয়েছে আর অনেককে যুদ্ধবন্দি বানানো হয়েছে, অনুরূপভাবে অনেক গনিমতের মালও হস্তগত হয়েছে যা থেকে তারা এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকিটা সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন আর অশ্বারোহীর অংশ পদাতিকদের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। এই যুদ্ধশেষে সেনাদল একদিন সেখানেই অবস্থান করে আর পরবর্তী দিন মদিনার উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করে।

হযরত ওসামা মদিনার দিকে একজন সুসংবাদদাতা প্রেরণ করেন। এই অভিযানে মুসলমানদের কোন সদস্য শহীদ হয় নি। যখন এই সফল ও বিজয়ী সেনাদল মদীনায় এসে উপস্থিত হয়, তখন হযরত আবু বকর মুহাজের ও আনসারদের সাথে মদীনার বাহিরে গিয়ে তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্বাগত জানান। হযরত বুরায়দা পতাকা দুলিয়ে সেনাবাহিনীর অগ্রে হাঁটছিলেন। সৈন্যবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে মসজিদে নববী পর্যন্ত যায়। হযরত ওসামা (রা.) মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেন এবং নিজ বাড়িতে চলে যান। বিভিন্ন বর্ণনানুসারে এই বাহিনী ৪০-৭০ দিন পর্যন্ত বাহিরে অবস্থান করার পর

মদিনায় ফিরে এসেছিল। ওসামার বাহিনীকে প্রেরণ করা মুসলমানদের জন্য অনেক লাভজনক প্রমাণিত হয়, কেননা আরবরা বলতে থাকে যে, মুসলমানদের মাঝে যদি শক্তি না থাকত, তাহলে তারা কখনোই এই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করত না। এভাবে কাফেররা এমন অনেক কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে করতে চাইছিল।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও সমর্থনে হযরত ওসামা (রা.) মহানবী (সা.) এর কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন আর ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও আর যুদ্ধে অসাধারণ সফলতার নিরিখেও এই অভিযানকে মহান প্রমাণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেছিলেন, সে সর্বোত্তম নেতা। খোদা তা'লার কৃপা, মহানবী (সা.) ও যুগ খলীফার দোয়ার কবুলিয়্যত এবং কল্যাণ এ কথা সাব্যস্ত করে যে, হযরত ওসামা (রা.)-ও তার শহীদ পিতা হযরত যায়েদ (রা.)-এর মতো শুধুমাত্র নেতৃত্বেরই যোগ্য ছিলেন না, বরং সেসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিশেষ এক মর্যাদা রাখতেন। আর যুগ খলীফার দৃঢ় সংকল্প এবং মনোবলই অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের বিভিন্ন আশঙ্কা ও আপত্তি সত্ত্বেও এই সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করে, আর এরপর খোদা তা'লা এই সৈন্যবাহিনীকে সফলতা এবং বিজয় দানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রথম শিক্ষা এটি দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর এখন সমস্ত বরকত শুধুমাত্র খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই নিহিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও 'সিররুল খিলাফা' পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যাহোক, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তাঁর পুত্র হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর ওপর, যারা আমাদের মনিব এবং অভিভাবক মহানবী (সা.) এর প্রিয়ভাজন ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা হাজারো রহমত এবং কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা হলো মোকাররম সিদ্দিক আদম দাম্বিয়া সাহেবের, যিনি আইভরি কোস্টের মুবাল্লেগ ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। গত বছর তার প্রোস্টেট-এর অপারেশনও হয়েছিল। একইভাবে তার প্লীহারও সমস্যা ছিল এবং ডায়লোসিসও চলছিল। চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ দিন থেকে তিনি আবিজান অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ অধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৪ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

সিদ্দিক আদম সাহেব ১৯৫০ সনে আইভরি কোস্টের লোসিঙ্গে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সনের কয়েক বছর পূর্বে বা আনুমানিক ১৯৭৭ সনের কাছাকাছি সময়ে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও ৭ কন্যা এবং ২জন পুত্র সন্তান রয়েছে। অতঃপর ১৯৮১ সালে জীবন উৎসর্গ করার পর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তার দুই বন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হন। আনুমানিক এক বছর পর্যন্ত সফরের কষ্ট সহ্য করার পর ১৯৮২ সনে রাবওয়া পৌঁছেন এবং জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৮৫-৮৬ সনে তিনি আইভরি কোস্টে ফিরে যান আর মৃত্যুকাল পর্যন্ত রীতিমত প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেছেন।

তার পাকিস্তান সফরের বিবরণ কিছুটা এমন যে, তিনি বলেন, ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ঘানায় সফর করেন, তখন খলীফাতুল মসীহ্র উপস্থিতি তার হৃদয়ে এমন এক পরিবর্তন সাধন করে যে, তার সম্পূর্ণ চিত্র পাল্টে যায়।

আইভরি কোস্টে পৌঁছে তিনি পাসপোর্ট তৈরী করেন এবং বলেন যে, খলীফাতুল মসীহ্‌কে দর্শনের লক্ষ্যে তার এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি পাকিস্তান সফরের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে মালির এক যুবক আমর মাআয সাহেব, যিনি আজকাল সেখানে আমাদের মুবাল্লেগ, মসজিদ আবিজান-এ আসেন আর নিজের এক স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শহরকে দেখা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। যাহোক, এভাবে এই তিনজন পাকিস্তান ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ১৯৮১ সনের ২০ আগস্ট তারিখে তারা তাদের যাত্রা আরম্ভ করেন। আইভরি কোস্ট থেকে যাত্রা করে প্রথমে ঘানা পৌঁছেন এবং সেখানকার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ ওয়াহাব আদম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দোয়ার পর তারা টোগো থেকে বেনীন অতিক্রম করে নাইজেরিয়ার লেগোস শহরে পৌঁছেন। সেখানকার মিশন হাউসে অবস্থান করার পর ক্যামেরুনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নাইজেরিয়ার মিশনারী ইনচার্জ সাহেবও দোয়ার সাথে তাদের বিদায় জানান এবং কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করেন। অতঃপর ক্যামেরুন অতিক্রম করে তারা চাদ-এ পৌঁছেন। সেখানে তাদেরকে বন্দি অবস্থার কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাহোক, ধৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে সফর অব্যাহত রাখেন। চাদ থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল কিন্তু এক স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তা'লা তাদের এ পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন যে, সৈন্য বাহিনীতে যোগ দাও। সুতরাং তারা লিবিয়ার সৈনিক দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন আর এই পরিস্থিতিতে খোদা তা'লা অদৃশ্য থেকে তাদের সাহায্য করেন আর অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে দেন। এমন এক সময় আসে যখন লিবিয়ার সরকার তাদের সবাইকে দেশান্তরিত করে দেয়। কিন্তু সকল কারণের আদি কারণ খোদা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, দেশান্তরিত হওয়ার আদেশনামাই শুধু বাতিল হয় নি বরং লিবিয়ার সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করে প্রায় আট মাস তারা লেবাননের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও পালন করেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয়, তখন তিনি তাদের ইনচার্জের কাছে পাকিস্তান যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। এতে তিনি বলেন, আরো কিছুদিন আমাদের কাছে অবস্থান কর, এরপর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বানিয়ে আপনাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিব, অর্থাৎ পাকিস্তান যাওয়ার পরিবর্তে আপনি আমেরিকা চলে যান। এতে তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন আর নিবেদন করেন যে, আমরা শিক্ষা অর্জনের জন্য পাকিস্তান যেতে চাই। যাহোক, পাকিস্তানী দূতাবাস ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু খোদা তা'লা তাদের সেনাবাহিনীর ইনচার্জের মাধ্যমে করাচী পর্যন্ত বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন, আর এভাবে ২৭ নভেম্বর ১৯৮২ সনে তিনি পাকিস্তান যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে পৌঁছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের দৃষ্টান্ত পুনরায় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়। ইনচার্জ সাহেব এক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন যে, ইনি ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতে পাকিস্তান যাচ্ছেন, তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার অনুরোধ করছি। অতএব সেই পুলিশ কর্মকর্তা তার অনেক সহযোগিতা করে। উড়োজাহাজ রাতে দামেস্ক থেকে রওয়ানা হয়ে সকালে করাচী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। এখন তিনি করাচী পৌঁছে গেলেও ভিসার সমস্যা ছিল। দোয়া করার পর ইমিগ্রেশন পুলিশের সামনে পাসপোর্টের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রেখে দেন। প্রশ্নোত্তর হয়। তিনি পাকিস্তানে আসার কারণ হিসাবে শিক্ষা অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তখন পুলিশ কর্মকর্তা সিল মেরে পাসপোর্টে স্বাক্ষর করে দেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করে যে, কোথায় যাবেন? তিনি উত্তরে বলেন, রাবওয়া

যাবো। তখন পুলিশ বলে, তুমি কি কাদিয়ানী? তখন অন্য কোন নেতিবাচক চিন্তা-ধারা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পূর্বে বা সিলমোহরকে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তারই এক সহকর্মী বলে উঠে, কাদিয়ানী হয়েছে তো কী হয়েছে? শিক্ষা অর্জনের জন্য এসেছে তাই তাকে যেতে দাও। যাহোক, তিনি বলেন, রাবওয়া যাওয়ার এবং খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তার এতই প্রবল ছিল আর এতই আবেগে আপ্লুত ছিলেন যে, তার এই চিন্তা-ই আসে নি যে, এখানে অর্থাৎ করাচীতে খোঁজ নিয়ে দেখি, এখানে জামা'ত থেকে থাকলে কোথায় আছে আর কোন সদস্য থেকে থাকলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিই যেন সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়। তিনি জামা'তের সাথে যোগাযোগ করার পরিবর্তে সোজা রেলস্টেশনে পৌঁছেন এবং সেখানে রাবওয়া যাওয়ার টিকিট চাইলেন। রেলওয়েতেও টিকিট প্রদানকারী ব্যক্তি লোভী ও বিদ্বেষী লোক ছিল। সে বলে, আহমদীদেরকে আমরা টিকিট দেই না। দুই ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বাক-বিতণ্ডার পর অবশেষে দ্বিগুণ ভাড়া নিয়ে টিকিট প্রদানে সম্মত হয়। কিন্তু সে এমন গাড়ির টকিট দিয়েছে যা সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন ছিল। আর করাচী থেকে রাবওয়া পৌঁছতে তার চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। যাহোক, খুবই কষ্টসাধ্য সফরের পর তিনি রাবওয়া পৌঁছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে দেখার তার বড় আগ্রহ ছিল। রাবওয়া পৌঁছে তিনি অতিথিশালায় যান। উর্দূ ভাষা তিনি জানতেন না। তিনি জানতেন না যে, ইতোমধ্যে কী হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে বার বার খলীফাতুল মসীহ রাবে বাক্য শুনে তার মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং এরপর যোগাযোগ করার পর জানতে পারেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের ইন্তেকাল হয়েছে আর এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে খেলাফতের আসনে আসীন আছেন। যাহোক, এরপর তার সাক্ষাৎ হয়, ১৯৮২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। জামেয়ার অধ্যায়ন সম্পন্ন করে আইভরি কোস্ট ফিরে যান এবং এরপর জামা'তের মাধ্যমে সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে তার নিযুক্তি হতে থাকে। ৮৭ সন থেকে ৯১ সন পর্যন্ত আইভরি কোস্ট, ৯১ থেকে ৯২ নাইজারে, ৯২ থেকে ৯৪ পর্যন্ত বেনিনে, ৯৪ থেকে ৯৬ পর্যন্ত টোগো এবং ৯৬ থেকে আমৃত্যু তিনি আইভরি কোস্টে নিযুক্ত থাকেন।

আইভরি কোস্টের মুবাল্লেগ বাসেত সাহেব লিখেন, সিদ্দীক আদম সাহেব খেলাফতের প্রকৃত প্রেমিক এবং জামাতের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় তার সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি দেখেছেন যে, মরহুম দোয়াগো ও তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন এবং সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতাও বেশ ছিল আর অধিকাংশ সময় নিজ পরিচিতদেরকে তাদের স্বপ্নের অর্থ বা মর্ম বলে দিতেন। নিয়মিত এখানে কেন্দ্রে নিজের মাসিক রিপোর্ট পাঠাতেন আর আমাকে দোয়ার চিঠি-পত্রও লিখতেন। তিনি উর্দূ ভাষায় চিঠি লিখতেন, এটি তার অভ্যাস ছিল। খুবই নেক, সময়ানুবর্তীতার প্রতি সদা সচেতন ছিলেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সর্বদা সময়ানুবর্তিতা মেনে চলতেন আর যে কাজই তার উপর ন্যস্ত করা হতো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘ পথের জামাতি সফরে মোটেও চিন্তিত হতেন না। খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে তবলীগ করতেন। দাজ্জালের ফিতনা, তার আবির্ভাব ও লক্ষণাবলী এবং বর্তমান যুগের নোংরামির কথা উল্লেখ করে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের উল্লেখ করতেন। শ্রোতারা তার বাচন ভঙ্গির জন্য সাধুবাদ না জানিয়ে পারতো না। তিনি লিখেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তবলীগে সফলকাম হয়েছেন। উত্তরাঞ্চলে তার তবলীগি সফরের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'লা হাজার হাজার ফল প্রদান করেছেন। নিজের পাকিস্তান সফর এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার

কথা তিনি অনেক উল্লেখ করতেন। আর এটিও বলতেন অর্থাৎ আহদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে এই নিদর্শন উপস্থাপন করতে যে, কিভাবে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতেও আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সুলতানে নাসীর তথা শক্তিশালী সাহায্যকারী দান করেছেন যারা এ পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। আর এরপর আল্লাহ তা'লা তাদেরকে কল্যাণে ভূষিত করেন এবং নিজ মাহদীর সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। সেখানকার ভাষা হলো জুলা, মরহুমের বাচন ভঙ্গি তাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিল। রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানও করতেন আর তার এসব অনুষ্ঠান খুবই উন্নতমানের হতো এবং তিনি খুবই সমাদৃত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততিকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততা দান করুন এবং তাঁর পুণ্যকর্মসমূহকে জারি রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, উকাড়া জেলার মিরাক নিবাসী মিয়া গোলাম মোস্তফা সাহেবের। তিনি ২৪ জুন তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন এবং ইবাদতের প্রবল আগ্রহ ছিল, বাজামা'ত নামায আদায়কারী এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন। তিনি তাদের মসজিদে নিজেই ফজরের আযান দিতেন। পুরো পরিবারকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন আর আল্লাহ তা'লা তাকে শেষমূহুর্ত পর্যন্ত রমজানের রোযা রাখার তৌফিক দিয়েছেন। তবলীগ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল, যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, কোন না কোনভাবে তার কাছে তিনি জামা'তের বাণী পৌঁছে দিতেন। খুবই মিশুক, পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। জুমুআর খুতবা নিয়মিত শুনতেন এবং সন্তানদেরও এ বিষয়ে নসীহত করতেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীতে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। তৃষ্ণার্তদের জন্য থারপার্কারে কূপ স্থাপনেরও তৌফিক পেয়েছেন তিনি। ওসীয়্যতের হিসাব নিজ জীবদ্দশাতেই পরিশোধ করে রেখেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে নিজের গৃহও জামা'তকে দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং নিজে একটি ছোট কক্ষে অর্থাৎ মসজিদে থাকতে থাকেন। আর এই বাড়িটি এখন মুরব্বী কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মরহুম মূসী ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। মরহুম বুরুন্ডির মুরব্বী গোলাম মুর্তজা সাহেবের পিতা ছিলেন, যিনি এখন কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এবং তার মায়ের যখন মৃত্যু হয়েছিল তখন মায়ের জানাযায়ও তিনি যেতে পারেন নি। গোলাম মুর্তজা সাহেব খুবই ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে এই উভয় বিয়োগব্যাথাকে সহ্য করেছেন। আল্লাহ তা'লা তার ধৈর্য ও মনোবল বৃদ্ধি করুন এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। তার এক পৌত্র কাশেম মোস্তফা সাহেব এবং এক দৌহিত্র মুহাম্মদ সাফীর উদ্দীন সাহেব উভয়েই মুরব্বী। অনুরূপভাবে আরেক পৌত্র বেলাল আহমদ ওয়াকফে নও এবং এ বছর ডাক্তার হয়ে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা তার প্রতি কৃপা ও ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। মুরব্বী গোলাম মুর্তজা সাহেব বিদেশে আল্লাহ্ তালার বার্তা পৌঁছানোর কাজে ব্যস্ত আর এ কারণে তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যেমনটি আমি বলেছি। আল্লাহ তা'লা তাকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে এই কষ্ট সহ্য করার তৌফিক দান করুন। জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ এদের উভয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াবো।